The Chittagong University Journal of Social Sciences Vol. 34, 2024 (P. 103-119)

মুজিব-ইন্দিরার রাজনৈতিক সম্পর্ক: একটি বিশ্লেষণ

উম্মে হাবিবা[১]

সার-সংক্ষেপ

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর মধ্যকার সম্পর্কের অনেক গুরুত্ব রয়েছে। ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে উভয়ের রাজনৈতিক সম্পর্কের সূচনা হয়। স্বাধীনতা যুদ্ধে ইন্দিরা গান্ধী অন্যতম প্রধান শুভাকাঙ্ক্ষী ও সমর্থনকারী হিসেবে বাংলাদেশের পাশে ছিলেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়কালে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিবেশ ছিল ভিন্ন। বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের যুদ্ধকে কেন্দ্র করে বেশিরভাগ দেশ দুটো ভিন্ন মেরুতে নিজেদেরকে আবদ্ধ রেখেছিল। একই সময় বৃহৎশক্তিগুলো পরস্পরের সাথে ঠান্ডা লড়াইয়ে যুক্ত ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন ছিল পাকিস্তানের পক্ষে, অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন (বর্তমান রাশিয়া) এবং ভারত ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে। যার ফলে, ওই সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যকার কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপন হওয়ার পাশাপাশি ভারত-সোভিয়েত সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। আমেরিকা ও রাশিয়ার নৌ বহর মুখোমুখি হয়েছিল। এমনকি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছিল। মুজিব-ইন্দিরার আদর্শগত মিল উভয়ের রাজনৈতিক সম্পর্ককে দৃঢ় ও শক্তিশালী করে তুলেছিল। তাঁদের রাজনৈতিক জীবন ও দর্শনের সাদৃশ্যসমূহ উভয়ের মধ্যকার পারস্পারিক আস্থা ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করেছিল। এ প্রবন্ধটি বাংলাদেশ ও ভারতের রাজনৈতিক পরিক্রমা এবং মুজিব-ইন্দিরা রাজনৈতিক সম্পর্ক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ও ইতিবাচক উৎস হিসেবে ভূমিকা পালন করবে। যার ফলে, মুজিব ও ইন্দিরার মধ্যকার রাজনৈতিক সম্পর্ক বিষয়ক গবেষণা ক্ষেত্র আরো প্রসারিত হবে এবং বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের গবেষণার নতুন দিক উন্মোচিত হবে।

১. ভূমিকা

বাংলাদেশ-ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে মুজিব-ইন্দিরা সম্পর্ক ঐতিহাসিক এবং তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম থেকেই উভয় দেশের সম্পর্ক ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ। মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সমর্থনের মধ্য দিয়ে এই সম্পর্কের গভীরতা বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশ-ভারত এবং মুজিব-ইন্দিরা রাজনৈতিক সম্পর্কের মূলে ছিলো আদর্শগত মিল। যার মধ্যে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা ছিলো অন্যতম। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকে ১৯৭৫ সালের আগস্ট পর্যন্ত এ সুসম্পর্ক অব্যাহত ছিলো। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ডের পর বাংলাদেশে দীর্ঘদিন সামরিক শাসন বজায় ছিলো। তৎকালীন সেনা সমর্থিত রাজনৈতিক সরকারসমূহ ভারতের প্রতি খুব একটা বন্ধুভাবাপন্ন ছিলো না। ১৯৭১ সালের পূর্বের মত বাংলাদেশ ভারতবিরোধী কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্র

[১] সহকারী অধ্যাপক, রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ। ই-মেইল: jenny.pol@cu.ac.bd

হয়ে পড়ে (সেলিম,২০০৯, পৃ. ৩৩)। একই সাথে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বৈশ্বিক রাজনীতিতে নানা প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়। দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতির পাশাপাশি আন্তর্জাতিক রাজনীতিতেও এর প্রভাব ছিলো উল্লেখযোগ্য। সত্তরের দশকে দাঁতাত (*Détente*)[২] সময়ে বহুবিভক্ত আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে দক্ষিণ এশিয়া ইস্যুতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ বড় নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। এই যুদ্ধকে কেন্দ্র করে তৎকালীন বিশ্বের দুই পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নসহ বিভিন্ন রাষ্ট্র প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান গ্রহণ করে। মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে বিভিন্ন রাষ্ট্র নিজেদের জাতীয় স্বার্থ ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিবেচনায় বাংলাদেশের পক্ষে-বিপক্ষে অবস্থান নেয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য ও সহযোগিতাকারী বিদেশি বন্ধু রাষ্ট্রসমূহের তালিকায় সবার ওপরে ভারতের স্থান। স্বাধীনতা যুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর ভারত নিকটতম প্রতিবেশি বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। এমনকি মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারত যুদ্ধ ঘোষণা করে। পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যা বন্ধ করা, স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে 'বাংলাদেশ' এর জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশের স্বীকৃতি আদায় এবং পাকিস্তানের কারাগার থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বিশ্বজনমত তৈরিতে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেন। সে সময় মুজিবনগর সরকার গঠন, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র দান এবং প্রায় এক কোটি শরণার্থী বাঙালীকে আশ্রয় ও চিকিৎসাসহ তাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব নিয়ে ইন্দিরা গান্ধী অকল্পনীয় সমর্থন দিয়েছেন। স্বাধীনতা পরবর্তী আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংগঠনের (জাতিসংঘ, জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন, ওআইসি) স্বীকৃতি কিংবা অংশগ্রহণের সময়ে ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের পাশে ছিলেন। ফলে, পাকিস্তান ও মধ্যপ্রাচ্যের আরব রাষ্ট্রসমূহের স্বীকৃতি ও সহযোগিতা পেতে সহজ হয়েছে। এক্ষেত্রে ভারত চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের সাথেও সম্পর্কন্নোয়নের প্রয়োজনে আলোচনায় বসেছে। এ আলোচনায় ১৯৭১ সালে যুদ্ধাপরাধের দায়ে আটক ১৯৫ জন পাকিস্তানী বন্দীর বিচার, আঞ্চলিক রাজনীতি, যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও মধ্যপ্রাচ্যের আরব রাষ্ট্রসমূহের সাথে সম্পর্কের উন্নয়ন ইস্যু ছিলো অন্যতম। এ সময় সৌদি আরব বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান না করলেও হজ্জ্ব পালনের জন্য জনগণ ভারতের পাসপোর্ট ব্যবহার করেছে। এ সকল বিষয়সমূহ বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে মূলত মুজিব-ইন্দিরার ধর্মনিরপেক্ষতা, অসাম্প্রদায়িক ও উদারপন্থি মনোভাবের কারণে। মুক্তিযুদ্ধে মুজিব-ইন্দিরার সহযোগিতামূলক সম্পর্ক এবং ইন্দিরার তথা ভারতের অবদানের কথা উল্লেখ না করে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস বর্ণনা সম্ভব নয়। একই সাথে মুজিব-ইন্দিরা সম্পর্ক আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনাও বটে।

[২] চীন-সোভিয়েত বিভক্তি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-সোভিয়েত স্নায়ু যুদ্ধের শেষের দিকে ১৯৭০-এর দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং চীনের সাথে সম্পর্ক উন্নত করার প্রচেষ্টা চালায়, যা *Détente* নামে পরিচিত। এর অর্থ উত্তেজনা শিথিল করা।

২. গবেষণা উদ্দেশ্য ও যৌক্তিকতা

বাংলাদেশ ও ভারতের পররাষ্ট্র নীতিতে উভয় দেশের সম্পর্কের বিষয়টি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে প্রাধান্য পায়। একটি দেশের পররাষ্ট্র নীতি প্রণয়নে সে দেশের ভৌগলিক অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে, ভৌগলিকভাবে বাংলাদেশের অবস্থান কৌশলগতভাবে অনেক গুরুত্ব বহন করে। বাংলাদেশের ভৌগলিক অখণ্ডতা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের সাথে সম্পৃক্ত। অন্যদিকে, বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থে ভারতের সঙ্গে পারস্পরিক আস্থা এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কোনো বিকল্প নেই। কারণ, সামগ্রিক অর্থে বাংলাদেশ ভারত পরিবেষ্টিত একটি রাষ্ট্র। বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে অনেকটা সময় অতিক্রম করছে। এই দুই দেশের মধ্যকার ইতিহাস-ঐতিহ্য ও ভূখন্ডগত সম্পর্ক রয়েছে। শেখ মুজিব ও ইন্দিরা গান্ধীর মধ্যকার রাজনৈতিক সম্পর্ক উভয়ের পরস্পরিক আস্থার ভিত্তিতে দুদেশের ইতিবাচক সম্পর্কের সূচনা করে। তাঁদের এই সম্পর্কের ফলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ দ্রুত সময়ের মধ্যে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিণত হয়। সমসাময়িক বিশ্ব রাজনীতিতে এর প্রভাব বিভিন্নভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। একই সাথে রাজনীতির বিভিন্ন মেরুকরণও ঘটেছিলো। এ প্রবন্ধে মুজিব ও ইন্দিরার রাজনৈতিক জীবন আলোচনা করা হয়েছে। দুজনের রাজনৈতিক আদর্শ ও দর্শনের মিলই উভয়ের রাজনৈতিক সম্পর্ককে আরো গভীর করেছে। এর পাশাপাশি মুজিব-ইন্দিরা রাজনেতিক সম্পর্ক ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। একই সাথে তাঁদের মধ্যকার রাজনৈতিক সম্পর্ক কীভাবে ক্রমবর্ধমানহারে পরিবর্ধনশীল হয়েছে, তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে মুজিব-ইন্দিরা রাজনৈতিক সম্পর্ক কীভাবে আন্তর্জাতিক রাজনীতির পট পরিবর্তনে প্রভাব বিস্তার করেছে, তা তুলে ধরা হয়েছে। মুজিব ও ইন্দিরার মধ্যকার রাজনৈতিক সম্পর্ক এবং এর আন্তর্জাতিক প্রভাব নিয়ে বিশ্লেষণধর্মী গবেষণা তেমন হয়নি। এ প্রবন্ধ মুজিব ও ইন্দিরার মধ্যকার রাজনৈতিক সম্পর্ক বিষয়ক গবেষণা ক্ষেত্রকে আরো প্রসারিত করবে। পাশাপাশি বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের গবেষণায় নতুন একটি ক্ষেত্র তৈরি করবে।

৩. গবেষণা পদ্ধতি

মুজিব-ইন্দিরা রাজনৈতিক সম্পর্ক এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এর প্রভাবের উপর প্রকাশিত গ্রন্থাদি, নিবন্ধ, পত্রিকা ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক রচনাবলীর ভিত্তিতে প্রবন্ধটি তৈরি করা হয়েছে। যেহেতু এটি মুজিব-ইন্দিরা রাজনৈতিক সম্পর্কের প্রেক্ষিত নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, তাই এ গবেষণায় কোনো ধরনের কল্পানুমানের অস্তিত্ব নেই। এ প্রবন্ধটিতে গুণবাচক পদ্ধতির পাশাপাশি বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণের মাধ্যমে ঐতিহাসিক ও বর্ণনামূলক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। প্রাথমিক উৎস হিসেবে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন পত্রিকা থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। মাধ্যমিক উৎস হিসেবে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ও

গবেষকদের গ্রন্থ ও প্রবন্ধ থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এ সকল তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে মুজিব-ইন্দিরা রাজনৈতিক সম্পর্ক উপস্থাপন করা হয়েছে।

৪. গবেষণা সাহিত্য পর্যালোচনা

মুজিব-ইন্দিরার রাজনৈতিক সম্পর্ক নিয়ে বিভিন্ন গবেষক ও বিশেষজ্ঞগণ গবেষণা ও বিশ্লেষণ করেছেন। বিশ্লেষকরা মূলতঃ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন কীভাবে মুজিব-ইন্দিরা রাজনৈতিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তা আলোচনা করেছেন। এ সম্পর্কের উপর উদ্ভুত বিভিন্ন পরিস্থিতির প্রভাব নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন।

মুজিব-ইন্দিরা রাজনৈতিক সম্পর্ককে কিছু গবেষক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, শক্তিশালী ও আদর্শগত মিলের উপস্থিতি হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। তাঁদের মধ্যে মো. আবদুল ওয়াদুদ ভূইয়া তাঁর “Emergence of Bangladesh and Role of Awami League’’ গ্রন্থে বলেন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের জনগণ ও সরকারের কাছ থেকে যে সর্বাত্মক সাহায্য ও সহানুভূতি লাভ করে, তার একটা বড় কারণ হলো মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী দল আওয়ামী লীগের দলীয় আদর্শ। শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগের সঙ্গে ইন্দিরা গান্ধীর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের আদর্শগত সাদৃশ্য ছিল (ভূঁইয়া, ১৯৮২)।

মোহাম্মদ সেলিম তাঁর “বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক” বইতে বলেছেন, বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার একটা বড় জায়গা জুড়ে আছে আদর্শবাদিতার প্রত্যক্ষ প্রভাব। আওয়ামী লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সাদৃশ্য, ১৯৭১-১৯৭৫ সময়কালে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে (সেলিম, ২০০৯, পৃ. ৩০)। মূলতঃ শেখ মুজিব ও ইন্দিরা গান্ধী উভয়ের আদর্শগত মিলই দুজনের রাজনৈতিক সম্পর্ককে আরো শক্তিশালী করেছে।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন বাহ্যিক শক্তির মধ্যে বাংলাদেশকে স্বাধীন করার ক্ষেত্রে ইন্দিরা গান্ধী সবচেয়ে বেশি তৎপর ছিলেন। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক গবেষক ড. ফায়সাল খোসা তাঁর “মেকিং অব মার্টারস ইন ইন্ডিয়া, পাকিস্তান অ্যান্ড বাংলাদেশঃ ইন্দিরা, ভুট্টো অ্যান্ড মুজিব” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, ইন্দিরা গান্ধীর প্রাথমিক ও সহজাত প্রতিক্রিয়া ছিল স্বাধীন বাংলাদেশকে অবিলম্বে স্বীকৃতি প্রদান, মুক্তি সংগ্রামে ও প্রতিরোধ আন্দোলনে পূর্ণ সামরিক সহযোগিতা দান (খোসা, ২০২২, পৃ. ১০২)।

ভারতীয় গবেষক ও সাংবাদিক সুখরঞ্জন দাশগুপ্ত “বঙ্গবন্ধু ও ইন্দিরা গান্ধীঃ দুই মহিরুহের ছায়া” গ্রন্থে উল্লেখ করেন, ইন্দিরা গান্ধী প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে জয় নিশ্চিত করার ব্যাপারে শেখ মুজিবের মতোই সমান আগ্রহী এবং তৎপর ছিলেন (দাশগুপ্ত, ২০২২, পৃ. ১৫)।

বেশ কিছু গবেষক মুজিব-ইন্দিরার রাজনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থকে উপাদান হিসেবে বিবেচনা করেন। গবেষক ও রাজনীতিবিদ মওদুদ আহমদ তাঁর "বাংলাদেশ: স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা" বইতে লিখেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পাকিস্তানের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব ছিল বাংলাদেশের প্রতি ভারতের সহযোগিতাদানের মূল কারণ। রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক এবং অর্থনৈতিক কারণে ভারতের আকাংখা ছিল উপমহাদেশের শক্তি কাঠামোতে তার চিরশত্রুকে দুর্বল করে তোলা (আহমদ, ২০১৫, পৃ. ২২৫)।

মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠা মুজিব-ইন্দিরা রাজনৈতিক সম্পর্ক আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বড় নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছিল। গবেষক মোহাম্মদ সেলিম তাঁর "বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও ভারতের রাজনৈতিক দল" গ্রন্থে বলেছেন, মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে দুই পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নসহ বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহ তাদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বার্থের বিবেচনায় বাংলাদেশের পক্ষে বা বিপক্ষে অবস্থান নেয় (সেলিম, ২০০৪, পৃ. ৭)।

মুজিব ও ইন্দিরা রাজনৈতিক সম্পর্কের উর্ধ্বে গিয়ে তাঁরা উভয় একে অপরের ব্যক্তিগত শুভাকাঙ্খী হয়ে উঠেন। এ সম্পর্কে ইন্দিরা গান্ধীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু পুপুল জয়কার "ইন্দিরা গান্ধী: জীবনী" গ্রন্থে মুজিব-ইন্দিরার সম্পর্কে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশ করেন। ১৯৭৫ সালে শেখ মুজিব হত্যা ষড়যন্ত্রের বেশকিছু আগাম তথ্য ইন্দিরা গান্ধী তাঁর গোয়েন্দা প্রতিনিধির মাধ্যমে কীভাবে ঢাকায় পৌঁছান, তা বিস্তারিত তুলে ধরা হয়। একই সাথে ইন্দিরার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ইস্যু ছাড়াও ভারতের জরুরি অবস্থা, নির্বাচনের জয়-পরাজয়সহ বিভিন্ন তথ্য লেখক এই গ্রন্থে বর্ণনা করেন (জয়কার, ২০১৮)।

৫. শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক জীবন

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। তাঁর জীবন সংগ্রামের প্রতিটি পর্যায়ে বাঙালিদের জন্য তাঁর ভালোবাসার ও ত্যাগের প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁর জীবনীগ্রন্থ *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*'তে তিনি লিখেছেন, "একজন মানুষ হিসেবে সমগ্র মানবজাতি নিয়ে আমি ভাবি। একজন বাঙালি হিসেবে যা কিছু বাঙালিদের সাথে সম্পর্কিত তাই আমাকে গভীরভাবে ভাবায় ... (রহমান, ২০১২)।" স্কুল জীবন থেকেই তাঁর মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলী দেখা যায়। যা পরবর্তীকালে তাঁকে একজন কেন্দ্রীয় নেতাতে পরিণত করেছিল। ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ গোপালগঞ্জ (ফরিদপুর) জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩৯ সালে শেখ মুজিব রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় হন। তখন তিনি গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুলের ছাত্র ছিলেন। একই সময় তিনি গোপালগঞ্জ মুসলিম ছাত্রলীগের সম্পাদক নির্বাচিত হন। ইতোপূর্বে তিনি স্বদেশী আন্দোলনের বিভিন্ন বৈঠকে যোগ দিতে শুরু করেন। ১৯৪৬

সালে কলকাতার ইসলামিয়া কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক (জিএস) নির্বাচিত হন। বেকার হোস্টেলে অবস্থানকালে তিনি 'অল বেঙ্গল মুসলিম লীগ' এর রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। শেখ মুজিব ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর একজন সক্রিয় অনুসারি ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মী।

১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর তিনি মুসলিম লীগের প্রগতিশীল নেতাকর্মীদের সাথে পুরান ঢাকায় অবস্থান করেন। ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি তিনি "পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ" প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্ব দেন। ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে তিনি প্রথম কারাবরণ করেন। পরবর্তীতে তিনি কারাগারে থাকাকালীন ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন "পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ" এর প্রতিষ্ঠাতা যুগ্ম-সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৫৩ সালে নভেম্বর মাসে আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক পদে মনোনীত হন। ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে গোপালগঞ্জ থেকে এমএলএ নির্বাচিত হন। পাকিস্তান সামরিক শাসকরা তাঁকে অধিকাংশ সময় কারাগারে অন্তরীণ করে রাখে।[৩] স্বাধীনতা সংগ্রামের লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ শেখ মুজিবের নেতৃত্বে পুনরুজ্জীবিত হয়। ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে শেখ মুজিব ঐতিহাসিক "৬ দফা কর্মসূচি" ঘোষণা করেন। ৬ দফার পক্ষে প্রচার-প্রচারণাকালে তিনি বহুবার কারাবরণ করেন। ১৯৬৮ সালে পাকিস্তান সরকার শেখ মুজিব সহ ৩৪ জন বাঙালি সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে। এই মিথ্যা মামলার ফলে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে ক্ষোভ-বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে "গণঅভ্যুত্থান" এর ফলে শেখ মুজিব সহ মামলার সকল আসামি নি:শর্ত মুক্তি পায়। ২৩ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ছাত্র-জনতার বিশাল সংবর্ধনা সমাবেশে শেখ মুজিব "বঙ্গবন্ধু" উপাধিতে ভূষিত হন।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন এবং প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৮৮টি আসন লাভ করে। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকরা আওয়ামী লীগকে সরকার গঠন করতে দেয়নি। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানের এক ভাষণে তিনি বাঙালি জাতিকে শত্রুর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য সবাইকে প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী পূর্ব পাকিস্তানে (বাংলাদেশ) গণহত্যা শুরু করে। সে সময় বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার বার্তা পাঠান এই বলে যে, "এটাই হয়তো আমার শেষ বার্তা। আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন... (আলী, ২০২০)।" তারপর ২৫ মার্চ মধ্যরাতে (২৬ মার্চ) বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়। শুরু হয় স্বশস্ত্র

[৩] শেখ মুজিব তাঁর রাজনৈতিক জীবনের ৪,৬৮২ দিন কারাভোগ করেন। স্কুল ছাত্র অবস্থায় ব্রিটিশ আমলে ৭ দিন এবং পাকিস্তান আমলে বাকী ৪,৬৭৫ দিন। দেখুন, *দৈনিক প্রথমআলো*, ৭ মার্চ, ২০১৭।

মুক্তিযুদ্ধ। দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধের পর ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী আত্মসমর্পন করে এবং বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। শেখ মুজিব পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি স্বদেশে ফিরে আসেন। ১৯৭১ থেকে ১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারী পর্যন্ত এবং আবার ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারী থেকে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট মৃত্যু পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারী থেকে ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারী পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তাঁর শাসনামলে তিনি নিরলসভাবে দেশের উন্নয়নে কাজ করেন। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ তারিখে সংবিধান কার্যকরের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রের মূলনীতি ঠিক করেন। সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে তিনি শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছেন। যুদ্ধাহতদের পুনর্বাসন, যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনরুদ্ধারের পাশাপাশি জনগণের মৌলিক অধিকার পূরণ করেন। শেখ মুজিব সমগ্র রাষ্ট্রকে একীভূত করার মাধ্যমে আর্থিকভাবে কার্যকর স্বাধীনতা অর্জনের অন্যন্য নজির স্থাপন করেন।[৪] প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের প্রথম ১০০ দিনের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলো মোকাবেলা করে তিনি তাঁর নেতৃত্বের সক্ষমতা প্রমাণ করেন। যার মধ্যে ছিল ১৯৭২ সালের ১৮ এপ্রিল কমনওয়েলথ এর সদস্যপদ লাভ, জাতিসংঘের ৫টি স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে ৪টি সহ ৬০টি দেশের স্বীকৃতি অর্জন। ওআইসির সদস্য পদ লাভের মাধ্যমে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের সাথে সম্পর্কন্নোয়নের চেষ্টা করেন। তাঁর শাসনামলে বিভিন্ন সময়ে দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রের শিকার হন। যার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট স্বপরিবারে তিনি নির্মমভাবে নিহত হন। এ হত্যাকাণ্ডের পর পশ্চিম জার্মানিতে অবস্থানরত তাঁর দুই কন্যাকে (শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা) ইন্দিরা গান্ধীর ব্যক্তিগত ইচ্ছায় ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য যে, এ হত্যাকাণ্ডের পূর্বে ইন্দিরা গান্ধীর পক্ষ থেকে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিনিধি কয়েকবার ঢাকায় এসে সতর্ক করেছিলেন। কিন্তু শেখ মুজিব তা আমলে নেয়নি। বরং শেখ মুজিব তাঁর দেশের জনগণকে বিশ্বাস করতেন, গভীরভাবে ভালোবাসতেন।

৬. ইন্দিরা গান্ধীর রাজনৈতিক জীবন

ভারতের ইতিহাসে ইন্দিরা গান্ধী ছিলেন তৃতীয় ও একমাত্র নারী প্রধানমন্ত্রী। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁকে ভারতের 'লৌহমানবী' বলা হয়। সাংবাদিক ওরিয়ানা ফাল্লাচির ভাষায়,

---

[৪] দেখুন, Ali Mahboob, Muhammad, (2020), "Bangabandhu: A political entrepreneur", March 13, *The Financial Express*, <https://thefinancialexpress.com.bd/views/bangabandhu-a-political-entrepreneur-1584113347>

'অনেকেই তাঁকে পছন্দ করত না। তাঁকে তারা বলত দাম্ভিক, উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও নিষ্ঠুর। অন্যদিকে, অনেকেই তাকে এতই পছন্দ করত যে, তারা তাকে বলতো দৃঢ়, সাহসী, শোভন, প্রতিভাময়ী (খোসা, ২০২২, পৃ. ২১)। ইন্দিরা গান্ধী পুরোপুরি একটি রাজনৈতিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা জওহরলাল নেহেরু ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পর ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ছিলেন এবং তাঁর পিতামহ মতিলাল নেহেরু ছিলেন দেশের অন্যতম একজন জাতীয়তাবাদী নেতা। তাঁর মা কমলা নেহেরু ছিলেন একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেত্রী। তিনি ১৯১৭ সালের ১৯ নভেম্বর এলাহাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। ইন্দিরার জন্মের তিন বছর পর ১৯২০ সালে ভারতে স্বরাজ আন্দোলন শুরু হয়। সে সময় ভারত জুড়ে অসহযোগ আন্দোলন চলতে থাকে। শিশু বয়স থেকে ইন্দিরা গান্ধী নিজ পরিবারের সদস্যদের রাজনীতি দেখেই বড় হয়েছেন। তাই ছোটবেলায় পুতুল খেলায় পুতুলগুলোকে দুই দলে ভাগ করতেন, এক দলে থাকতো সংগ্রামী যোদ্ধারা আরো অন্য দলে শত্রুরা। এই দুই দলের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধিয়ে দিতেন এবং যোদ্ধাদের কে জেতাতেন। রাজনৈতিক পরিবারে বেড়ে উঠায় তাঁর জীবনের নানা ক্ষেত্রে প্রতিকূল প্রভাব পড়েছিল। পরিবারের সদস্যরা প্রায়শই কারাগারে থাকার দরুণ বিভিন্ন সময় তাঁর পড়াশোনায় বিঘ্ন ঘটত। একবার তরুণ বয়সে ইন্দিরা বাড়িতে আসা কয়েকজন অতিথিকে বলেছিলেন, 'আমি দুঃখিত। বাড়িতে কেউ নেই। আমার বাবা, মা, দাদা, দাদী আর ফুফু সবাই কারাগারে (খোসা, ২০২২, পৃ. ২২)।' ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা শেষ না করে তিনি ভারতে ফিরে আসেন। ১৯৪২ সালে ইন্দিরা ফিরোজ গান্ধীকে বিয়ে করেন। ইন্দিরাকে ভারতের একজন শক্তিশালী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মনে করা হয়। তাঁর বাবার পর তিনি দেশের দ্বিতীয় দীর্ঘতম প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৪৭ থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত অনানুষ্ঠানিকভাবে তাঁর পিতার ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এর মধ্যে ১৯৫৫ সালে তিনি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য হন এবং ১৯৫৯ সালে কংগ্রেস পার্টির সভাপতি নিযুক্ত হন। ১৯৬৪ সালে নেহেরুর মৃত্যুর পর তাঁকে লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর মন্ত্রিসভায় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী করা হয়। ১৯৬৬ সালে শাস্ত্রীর মৃত্যুর পর ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। তিনি ১৯৬৬ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত, পুনরায় ১৯৮০ থেকে ১৯৮৪ সালে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন *(দ্যা গার্ডিয়ান*, ১৯৮৪)। ১৯৯৯ সালে *বিবিসি*র একটি জরিপে ইন্দিরা গান্ধীকে 'ওমেন অব দ্য মিলেনিয়াম' হিসেবে মনোনীত করা হয়। অনেকেই ভেবেছিলেন, যেহেতু তিনি একজন নারী, তিনি দুর্বল হবেন। এজন্য তাঁকে বোবা পুতুলও বলা হয়েছিল। বাস্তবে, তাঁর নেতৃত্ব এবং নীতিগত সিদ্ধান্ত তাঁকে ভারতীয় রাজনীতির ইতিহাসে সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রীদের একজন করে তুলেছিল। তিনি ছিলেন উপমহাদেশের প্রথম নারী যিনি শীর্ষ রাজনৈতিক অবস্থানে ছিলেন। অনেকক্ষেত্রেই তাঁর আচরণে ও সিদ্ধান্তে তাঁর বাবার

বিপরীত বৈশিষ্ট্য দেখা যেত। ইন্দিরা গান্ধী বলেছিলেন, "আমার বাবা ছিলেন রাষ্ট্রনায়ক। আমি একজন রাজনৈতিক মহিলা। আমার বাবা ছিলেন সাধু। আমি নই (খোসা, ২০২২, পৃ. ২৪)।" তাঁর দারিদ্র বিরোধী পদক্ষেপ, সবুজ বিপ্লব এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সমর্থন ও সহযোগিতা তাঁকে ব্যাপক জনপ্রিয় করে তুলে। ১৯৮৪ সালের ৩১ অক্টোবর তিনি নিজ বাসভবনে শিখ দেহরক্ষীর গুলিতে নিহত হন। ইতোপূর্বে শিখদের পবিত্র ধর্মস্থান স্বর্ণমন্দিরে সামরিক অভিযানে শতশত শিখ ধর্মালম্বীর মৃত্যুর পর বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা ইন্দিরার নিরাপত্তার স্বার্থে শিখ নিরাপত্তা কর্মীদের প্রত্যাহারের জন্য সুপারিশ করেছিলেন। কিন্তু তিনি এতে সম্মত হননি। এর মাধ্যমে ইন্দিরা গান্ধীর অসাম্প্রদায়িক ও উদারনৈতিক মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে।

৭. মুক্তিযুদ্ধ ও মুজিব-ইন্দিরা রাজনৈতিক সম্পর্ক

মুজিব-ইন্দিরা মজবুত রাজনৈতিক সম্পর্কের শুরু হয় এক কোটি রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে, যারা শরনার্থী হিসেবে মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতে আশ্রয় পেয়েছিল। ইন্দিরা যখন শরনার্থীদের আশ্রয় দেয় তখন ভারতের অর্থনীতি ছিলো নড়বড়ে। সে সময় ভারতের রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি মোটেই ইন্দিরার অনুকূলে ছিলো না। ১৯৭১ সালে যুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানের সামরিক আদালত শেখ মুজিবকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল। সেজন্য ইন্দিরা গান্ধী শেখ মুজিবের জীবন বাঁচানোর জন্য যে কোনো মূল্য দিতে প্রস্তুত ছিলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর শেখ মুজিব ও ইন্দিরা গান্ধীর প্রথম আনুষ্ঠানিক দেখা হয় ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি। তবে অনেক গবেষকের মতে তাঁদের মধ্যে এর পূর্বেও যোগাযোগ হয়েছিল।[৫] ১০ জানুয়ারি ব্রিটিশ সরকারের বিমানে করে সকাল আটটায় শেখ মুজিব দিল্লির বিমানবন্দরে অবতরণ করেন। এর ঠিক দুদিন আগেই পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি লন্ডনে পৌঁছেন। লন্ডনে থাকা অবস্থায় ইন্দিরা গান্ধীর সাথে তাঁর টেলিফোনে যোগাযোগ হয়। দিল্লির পালাম বিমানবন্দরে শেখ মুজিবকে স্বাগত জানান ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরি, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও অনেক ক্যাবিনেট মন্ত্রী। শেখ মুজিবকে সেখানে সংবর্ধনা দেয়া হয়।

[৫] শেখ মুজিবুর রহমান ও ইন্দিরা গান্ধীর প্রথম দেখা হয়েছিল লন্ডনের সাউদাম্পটন স্কোয়ারে। তাঁদের প্রথম সাক্ষাৎকারটির ব্যবস্থা করেছিলেন নাথ বাবু, যিনি একজন বাঙালি ছিলেন। দেখুন, দাশগুপ্ত, সুখরঞ্জন (২০২২), "বঙ্গবন্ধু ও ইন্দিরা গান্ধী: দুই মহিরুহের ছায়া", জিনিয়াস পাবলিকেশন্স: ঢাকা, পৃ. ৩৮, ৩৯। এছাড়া মুজিব নগর সরকারের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদের ভারতে গমন প্রক্রিয়া ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে দ্রুত সাক্ষাতে স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, ইতোপূর্বে মুজিব-ইন্দিরার সম্পর্ক ও যোগাযোগ সুদৃঢ় ছিল। ধারণা করা হয় যে, শেখ মুজিব ভারতের সাথে পূর্বেই সামগ্রিক বিষয়ে আলোচনা সম্পন্ন করেছিলেন। দেখুন, ফায়েক উজ্জামান, মোহাম্মদ (২০০৮), "মুজিব নগর সরকার ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ", বাংলা একাডেমী: ঢাকা, পৃ. ১০১।

যুদ্ধকালীন সময়ে মুজিবের নিরাপত্তা নিয়ে ইন্দিরা গান্ধী বেশ উদ্বিগ্ন ছিলেন। গান্ধী তাঁর মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত অনুসারে জুলফিকার আলী ভুট্টোর সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যম খুঁজে বের করার চেষ্টা চালান। সে সময় পূর্ব পাকিস্তান সরকারের মুখ্য সচিব মুজাফফর হোসেনের স্ত্রী লায়লা হোসেন ছিলেন জুলফিকার আলী ভুট্টোর পূর্ব পরিচিত। তাই ইন্দিরা লায়লাকে অনুরোধ করেন শেখ মুজিবের মুক্তির ব্যাপারে ভুট্টোর সঙ্গে আলোচনা করতে। ভুট্টো যুক্তরাষ্ট্র যাওয়ার পথে লন্ডনে যাত্রাবিরতিকালে হিথ্রো বিমানবন্দরে লায়লার সঙ্গে দেখা করেন। মূলতঃ ভারত জানতে চেয়েছিল পাকিস্তান শেখ মুজিবকে কি দেশে ফিরে যাবার জন্য মুক্ত করবেন, নাকি মৃত্যুদন্ডের জন্য সামরিক আদালতের কাছে হস্তান্তর করবেন। ভারতের এ পরিকল্পনা সফল হয়। ভুট্টো লায়লার মাধ্যমে ইন্দিরা কে জানিয়ে দেন যে পাকিস্তান শেখ মুজিবকে বাংলাদেশে ফিরে যাবার জন্য মুক্তি দেবে। মুজিবের মুক্তির বিনিময়ে তিনি কী চান তা পরবর্তী সময়ে ইন্দিরা গান্ধীকে জানিয়ে দেবেন। তখন শেখ মুজিবের মুক্তি নিয়ে ইন্দিরা গান্ধী আশাবাদী হয়ে উঠেন (*বিবিসি বাংলা*, ২০২২)। শেখ মুজিবের মুক্তি লাভের পর ১০ জানুয়ারি ইন্দিরা গান্ধীর সাথে সাক্ষাতের মাধ্যমে বাংলাদেশ-ভারতের রাজনৈতিক সম্পর্কের ভিত্তি আরো বেশি মজবুত হয়েছিল।

১৯৭১ সালে বাঙালি জাতির সঙ্গে পাকিস্তানি বাহিনীর সশস্ত্র যুদ্ধ শুরু হওয়ার মাত্র এক সপ্তাহ আগে ভারতের পঞ্চম সাধারণ নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস ভোটে জয়লাভ করে। নতুন সরকার গঠন ও নবগঠিত সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ইন্দিরা গান্ধী শপথ নিতে না নিতেই পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী বাংলাদেশের সর্বত্র নির্বিচার গণহত্যা, অবাধ লুণ্ঠন এবং ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। পূর্ববাংলার মানবতার বিপর্যয় দেখে এবং পাকিস্তানী সৈন্যদের গণহত্যার খবর শুনে ইন্দিরা ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ লোকসভায় বাংলাদেশের সমর্থনে ঐতিহাসিক এক ভাষণ দেন। ৩০ মার্চ লোকসভায় প্রস্তাব উত্থাপনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী জনগণের প্রতি দৃঢ় সমর্থন ব্যক্ত করেন। ৪ এপ্রিল নিখিল ভারত কংগ্রেসের সভায়ও তিনি মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন দেয়ার অঙ্গীকার করেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার সাথে সাথে বাংলাদেশিরা শরণার্থী হিসেবে ভারতে প্রবেশ করতে শুরু করে। ১৯৭১ সালের ১০ আগস্টের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ৭৫ লাখেরও বেশি শরণার্থী ভারতে পাড়ি জমায়। এ সময় ভারতীয় পার্লামেন্ট সদস্যদের উপর প্রচুর চাপ ছিল। বিশেষ করে ত্রিপুরা এবং পশ্চিমবঙ্গ দুটি রাজ্য, যেখানে সবচেয়ে বেশি শরণার্থী ছিল। ক্ষমতাসীন দল সহ লোকসভার কিছু সদস্য বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দেয়ার জন্য সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করেন। তাদেরকে ভারতীয় দন্ডবিধির ১৮৮ ধারায় গ্রেফতারও করা হয়। প্রধানমন্ত্রী গান্ধী বলেন, যাকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ সমস্যা বলে দাবি করা হয়েছে, তা ভারতের অভ্যন্তরীণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে (Pattanaik, 2020)। ইন্দিরা গান্ধী সে সময় কূটনৈতিক অভিযানের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশ সফর করেন। প্রভাবশালী দেশগুলোর সাথে

যোগাযোগ স্থাপন করে শরনার্থীদের জন্য ত্রাণ সহায়তা নিশ্চিত করা ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। এর পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় যদি দ্রুত পূর্ব পাকিস্তান সংকট নিস্পত্তি না করে তাহলে ভারত সামরিক হস্তক্ষেপের হুমকি দেয়। ভারত ১৯৭১ সালের ৯ আগস্ট নয়াদিল্লিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে এক শান্তি চুক্তি করে। দুই দেশের মধ্যকার বন্ধুত্ব এবং সহযোগিতা আরো জোরদার করা ছিল এ চুক্তির প্রধান উদ্দেশ্য। মূলত: এই চুক্তি ছিলো ভারতের রক্ষাকবচ। চুক্তি অনুযায়ী, ভারত যদি কোনভাবে কোন দেশ দ্বারা আক্রমণ হয় তবে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতকে সহায়তা করবে। যার দ্বারা ইন্দিরার রাজনৈতিক নৈপুণ্য ও বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায় (সরকার,২০২২, পৃ. ৪-৫)।

মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ইন্দিরা গান্ধী নিজ দেশের সাথে সাথে বিশ্বের সর্বত্র বিভিন্ন ব্যক্তি, সংস্থা, সংগঠন ও রাষ্ট্রের সমর্থন ও সহযোগিতা চেয়েছেন। পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যা বন্ধ করা, স্বাধীন দেশ হিসেবে বিভিন্ন দেশের স্বীকৃতি আদায় এবং পাকিস্তানের কারাগার থেকে শেখ মুজিবের মুক্তির লক্ষ্যে বিশ্বজনমত গঠনে ইন্দিরা গান্ধী নানা কৌশল ও নিরলস কর্মপ্রচেষ্টা দেখিয়েছেন। মুজিবনগর সরকার গঠন, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র দান, শরণার্থীদের আশ্রয় ও খাদ্য দেওয়ার মতো সব বিষয়েই তিনি অকল্পনীয় দৃঢ়তা দেখিয়েছেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের আনুমানিক ৭,০০০ কোটি টাকার বেশি ব্যয় হয়েছে। ভারতের প্রায় ১,৫০০ সামরিক সদস্য নিহত হয়েছেন, আহত হয়েছেন ৪,০৬১ জন এবং নিখোঁজ হয়েছেন ৫৬ জন (দে, ২০১৯, পৃ. ১০)

স্বাধীনতার পর দিল্লিতে আয়োজিত সংবর্ধনা সভায় ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে শেখ মুজিবুর রহমান বলেন,

> আপনাদের প্রধানমন্ত্রী, আপনাদের সরকার, আপনাদের সৈন্যবাহিনী, আপনাদের জনসাধারণ যে সাহায্য ও সহানুভূতি আমার দুঃখী মানুষকে দেখিয়েছেন, চিরদিন বাংলার মানুষ তা ভুলবে না। শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী আমার জন্য দুনিয়ার এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে তিনি চেষ্টা করেন নাই আমাকে রক্ষা করার জন্য। আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। আমার সাড়ে সাত কোটি মানুষ তাঁর কাছে এবং তাঁর সরকারের কাছে কৃতজ্ঞ। আমার জনসাধারণ ভারতবর্ষের জনসাধারণের কাছে কৃতজ্ঞ। আর যেভাবে এক কোটি লোকের খাওয়ার বন্দোবস্ত এবং থাকার বন্দোবস্ত আপনারা করেছেন আমি জানি ভারতবর্ষের মানুষ তারাও কষ্টে আছে, তাদেরও অভাব-অভিযোগ আছে, তা থাকতেও তারা সর্বস্ব দিয়েছে, আমার লোকের সাহায্য করার জন্য, চিরদিন আমরা তা ভুলতে পারব না (সরকার, ২০২৩)।

৮. ইন্দিরা গান্ধীর বাংলাদেশ সফর

স্বাধীনতার পর শেখ মুজিবের নেতৃত্বে সরকার গঠনের পর ১৯৭২ সালের ১৭ মার্চ ইন্দিরা গান্ধী প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ সফরে আসেন। এ সময় সারা দেশের শহর, বন্দর, গ্রামসহ সব জনপদ, এমনকি যানবাহনগুলো পর্যন্ত 'ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী অমর হোক' লেখাবিশিষ্ট পোস্টারে ছেয়ে যায়। উভয় দেশের সাধারণ মানুষের মাঝেও ব্যাপক উৎসাহের সৃষ্টি হয়। ইন্দিরা গান্ধীর আগমন উপলক্ষে ১৭ মার্চ সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়। তেজগাঁও বিমানবন্দর থেকে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর একটি হেলিকপ্টারে চড়ে ইন্দিরা গান্ধী প্রথমে সরাসরি বঙ্গভবনে যান। যেটি ছিল তৎকালীন রাষ্ট্রপতি আবু সাইদ চৌধুরীর সরকারি বাসভবন। সফরের পরবর্তী তিন দিন ইন্দিরা গান্ধী সেখানেই থাকেন। বঙ্গভবনের তৎকালীন রাষ্ট্রপতির স্পেশাল অফিসার মাহবুব তালুকদার তার স্মৃতিচারণ গ্রন্থ *'বঙ্গভবনে পাঁচ বছর'* এ লিখেছেন, ইন্দিরা গান্ধীর সফর উপলক্ষে বঙ্গভবনকে নতুন সাজে সজ্জিত করা হয়। অভ্যন্তরীণ সাজ-সজ্জার জন্য কলকাতা থেকে মিসেস বসন্ত চৌধুরীকে আনা হয়েছিল। বসন্ত চৌধুরী স্বনামখ্যাত চিত্রনায়ক ও নাট্যাভিনেতা ছিলেন। তাঁর স্ত্রী স্বনামখ্যাত ইন্টেরিয়র ডেকোরেটর। তিনি দিন রাত পরিশ্রম করে বঙ্গভবনকে সাজিয়েছিলেন। ইন্দিরা গান্ধীর সেই ঢাকা সফর এতটাই উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল যে ভারতের অনেক প্রতিষ্ঠান তখন বাংলাদেশি পত্রিকাগুলোতে বিজ্ঞাপন দিয়ে দুদেশের সম্পর্ককে শুভকামনা জানিয়েছিল।

৯. মুজিব-ইন্দিরা শাসনামলের চুক্তিসমূহ

মুজিব-ইন্দিরার শাসনামলে পারস্পরিক আস্থার ভিত্তিতে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। এ সময়টিকে দু'দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের জন্য সেরা যুগ বলে মনে করা হয়। এ সময় ভারত ও বাংলাদেশ বাণিজ্য, সংযোগ, শিক্ষা, কৃষি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, সংস্কৃতি এবং জল ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। যার মাধ্যমে দুই দেশের মধ্যকার সম্পর্ক ও সহযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। যার মধ্যে অন্যতম চুক্তিগুলো নিম্নরূপ:

১. মৈত্রী ও সহযোগিতা চুক্তি (১৯৭২)

ইন্দিরা গান্ধীর প্রথম বাংলাদেশ সফরে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ২৫ বছর মেয়াদী একটি 'মৈত্রী ও সহযোগিতা চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয়। গান্ধীর সফরের তৃতীয় দিনে ১৯৭২ সালের ১৯ মার্চ সম্পাদিত এ চুক্তিটিতে শেখ মুজিব ও ইন্দিরা গান্ধী স্বাক্ষর করেন। চুক্তিটি ছিল অনেকটা ১৯৭১ সালের ভারত-সোভিয়েত চুক্তির মত। ১২টি অনুচ্ছেদ সম্বলিত এ চুক্তিটি দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। যেমন: দুই দেশ একে অন্যের স্বাধীনতা,

সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতার বিষয়ে সম্মান প্রদর্শন করবে এবং কেউই একে অন্যের অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে হস্তক্ষেপ করবে না। কোনো পক্ষ স্বাক্ষরকারী অপর পক্ষের বিরুদ্ধে পরিচালিত কোন সামরিক জোটে অংশ নেবে না। পরস্পর পরস্পরের প্রতি কোন আক্রমণ করবে না এবং অপর পক্ষের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে এমন কোন কাজে নিজের ভূমি ব্যবহার করতে দেবে না। শান্তি ও নিরাপত্তা বিষয়ক কিছু ধারাও ছিল এ চুক্তিতে। এছাড়া দুই দেশের মধ্যে শিক্ষা, খেলাধুলা, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি সহায়তার উল্লেখ ছিল (সেলিম, ২০০৯, পৃ. ৯৪)। উল্লেখ্য যে, এ চুক্তির কিছু ধারা নিয়ে মুজিব সরকারের বিরোধীদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছিল[৬]।

২. স্থল সীমানা চুক্তি (১৯৭৪)

১৯৭১ সালের পর দুই দেশই সীমান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির উদ্যোগ নেয়। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালের ১২-১৭ মে ভারত সফর করেন। এই সফরের গুরুত্ব সম্পর্কে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের তৎকালীন ডেপুটি হাই কমিশনার জে.এন দীক্ষিত বলেন, "the May 1974 visit was the most substantive in terms of result after Mrs. Indira Gandhi's trip to Dhaka in March 1972." ১৯৭৪ সালের ১৬ মে নয়াদিল্লিতে ইন্দিরা গান্ধী ও শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যে সীমান্ত চুক্তি হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী ভারতের ভেতরে থাকা দক্ষিণ বেরুবাড়ি ভারতের দখলে চলে যায় এবং দহগ্রাম ও আঙ্গরপোতা বাংলাদেশের অধিকারে আসে। ছিটমহল দুটি বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন থাকায় পানবাড়ি মৌজার সঙ্গে যুক্ত করার জন্য তিনবিঘা জমি ভারত বাংলাদেশের অনুকূলে স্থায়ী ইজারা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। চুক্তি সইয়ের পরপরই বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ এটি অনুমোদন করে। দু'দেশের প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ও বিশেষ কূটনৈতিক দক্ষতার কারণে সীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষর সম্ভব হয়। যদিও ভারত আদালতে মামলার কারণে দীর্ঘদিন বিষয়টি ঝুলিয়ে রাখে।[৭] শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার ২০০৯ সালে এটি সমাধানের জন্য পদক্ষেপ নেয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও তাঁর শাসনামলে "প্রতিবেশী সবার আগে" নীতির সাথে বাংলাদেশের

[৬] জাতীয় সংসদ ও সংসদের বাহিরে কোনো বিরোধীদল এই চুক্তির পক্ষে সমর্থন জানায়নি। বিভিন্ন সংবাদ পত্র ও গবেষণা নিবন্ধে চুক্তির ব্যাপক সমালোচনা করা হয়। বিশেষভাবে প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত চুক্তির ৮,৯ ও ১০ নং ধারা ছিলো সমালোচকদের আক্রমণের মূল লক্ষ্য। দেখুন, সেলিম, মোহাম্মদ (২০০৯), "বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক", বাংলা একাডেমী: ঢাকা, পৃ.৯৪; এমতাবস্থায়, এই চুক্তির মেয়াদ শেষে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার পরবর্তীতে উক্ত চুক্তির নবায়ন অথবা মেয়াদ বৃদ্ধি করেনি।

[৭] হাসান, সোহরাব (২০১৫), "মুজিব-ইন্দিরা থেকে হাসিনা-মোদি", ০৭ জুন, *দৈনিক প্রথম আলো*।

সাথে এমন কিছু উদ্যোগ নেন, যা দীর্ঘদিন ধরে আটকে ছিল। ২০১৫ সালের ৭ মে ভারতীয় পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ লোকসভায় স্থল সীমানা চুক্তি অনুমোদিত হয়। যার ফলশ্রুতিতে ৩১ জুলাই ছিটমহল হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

১০. আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে মুজিব-ইন্দিরা রাজনৈতিক সম্পর্কের প্রভাব

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের সূচনা করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বাহ্যিক সমর্থন পাওয়া মোটেই সহজ ছিল না। প্রকৃতপক্ষে, ভারত ও তার বন্ধু রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়ন ছাড়া শক্তিধর অনেক দেশ একটি অখণ্ড পাকিস্তানের পক্ষে ছিল। জাতিসংঘের বিভিন্ন সদস্য রাষ্ট্রের আশঙ্কা ছিল, বাংলাদেশের অভ্যুদয় যদি মেনে নেয়া হয়, তবে বিশ্বের অন্যান্য দেশেও নতুন করে যুদ্ধ শুরু হতে পারে। সেই সময়ে বৈশ্বিক শক্তি ও রাজনীতি পূর্ব-পশ্চিম "ঠান্ডা যুদ্ধ" তে রূপ নেয়। পাকিস্তান যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বেশ কয়েকটি সামরিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করে, তখন ভারত তার বাহ্যিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের দিকে ঝুঁকে পড়ে। ১৯৬০-র দশকে চীন-সোভিয়েত বিবাদ এতোটাই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, সে সময় চীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক পুন:স্থাপনের চেষ্টা করে।[৮] এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীনের জাতিসংঘে যোগদানের বিষয়ে তার আপত্তিও প্রত্যাহার করে নেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন উভয়ের বন্ধু রাষ্ট্র হিসেবে সম্পর্ক পুনরুদ্ধারে পাকিস্তান একটি সমঝোতার ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশ-পাকিস্তান মধ্যকার যুদ্ধ শুরু হওয়ার সাথে সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন স্পষ্টভাবে পাকিস্তানকে সমর্থন করে। অন্যদিকে, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারত বাংলাদেশকে সমর্থন জানায়। মার্কিন প্রশাসন বাংলাদেশের (পূর্ব পাকিস্তান) রাজনৈতিক অস্থিরতাকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয় হিসেবে দেখে এবং আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপের জন্য ভারতের দাবিকে অযৌক্তিক হস্তক্ষেপ বলে বিবেচনা করে। প্রেসিডেন্ট নিক্সন আশংকা করেছিলেন যে, পাকিস্তানকে ভেঙে ফেলা এবং বাংলাদেশ সৃষ্টির অর্থ হচ্ছে দক্ষিণ এশিয়ায় সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা বৃদ্ধি পাবে এবং ভারত মহাসাগর অঞ্চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ হ্রাস পাবে। চীনের ভয় ছিলো যে, এশিয়ায় সোভিয়েত আধিপত্য তাদের আঞ্চলিক রাজনীতিতে আরো দুর্বল করে তুলবে। পাকিস্তান উপসাগরীয় আরব রাষ্ট্রসমূহকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিল যে, বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম হল বৃহত্তম ইসলামী জাতিকে দুর্বল করার ভারতীয়

---

[৮] ১৯৪৯ সালে মাও সেতুং-এর কমিউনিস্ট বিপ্লবের পর থেকে, গণপ্রজাতন্ত্রী চীন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক ঠাণ্ডা যুদ্ধ, বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞাসহ বিভিন্ন কারণে তাদের কোনো কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল না। ১৯৭১ সাল নাগাদ, সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে চীনের বৈরী সম্পর্ক এবং ভারত- সোভিয়েত ইউনিয়ন সহযোগিতার সম্পর্কের ফলে চীন ও যুক্তরাষ্ট্র টেবিল টেনিস খেলার মাধ্যমে তাদের মধ্যকার কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে। যাকে বলা হয় পিংপং ডিপ্লোমেসি। Andrews, Evan, 2018. “How Ping-Pong Diplomacy Thawed the Cold War” *History*, October 19, https://www.history.com/news/ping-pong-diplomacy

প্রচেষ্টা এবং তা ইসলামকে বিপদে ফেলবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন এবং উপসাগরীয় আরব রাষ্ট্রগুলোর সমর্থনে পাকিস্তান এতটাই আত্মবিশ্বাসী হয়েছিলো যে, রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সালের ১ ডিসেম্বর সর্বাত্মক যুদ্ধের হুমকি প্রদান করেন। পরের দিন সন্ধ্যায় ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তান অতর্কিত বিমান হামলা শুরু করে। যা ছিলো ভারতের উপর পাকিস্তানের চাপ সৃষ্টির কৌশল। পাকিস্তানিদের পক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গোপসাগরে পারমাণবিক শক্তি চালিত বিমান ক্যারিয়ার ইউএসএস এন্টারপ্রাইজের নেতৃত্বে একটি টাস্ক ফোর্সের নির্দেশ দেন। টাস্ক ফোর্স ১৯৭১ সালের ১১ ডিসেম্বর স্টেশনে পৌঁছেছিল। পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে, সোভিয়েত নৌবাহিনী তাদের পূর্বাঞ্চলীয় নৌবহর থেকে দুটি জাহাজ পাঠায়, যা পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্রে সজ্জিত এবং একটি পারমাণবিক ডুবোজাহাজও মার্কিন টাস্ক ফোর্সের পিছনে ছিল (মুখার্জি, ২০১৩, পৃ. ২৮৮)। হঠাৎ করে দক্ষিণ এশিয়ায় সীমিত যুদ্ধ পরমাণু মাত্রা নিয়ে বৈশ্বিক সংঘর্ষে পরিণত হতে দেখা যায়। বাংলাদেশ যখন একটি নতুন জাতি হিসাবে যুদ্ধ থেকে বেরিয়ে আসে তখন যুদ্ধের সমাপ্তি আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক শক্তি খেলায় একটি নতুন সমীকরণ তৈরি করে। আয়তন ও জনসংখ্যা, অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তিতে ভারত এই অঞ্চলে প্রধান শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। একই সাথে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বাংলাদেশ-ভারত সবসময়ের বন্ধু হিসেবে নিজেদের প্রকাশ করে। বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক সরকার গঠিত হওয়ায় পর দ্রুত আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আসতে থাকে। তবে পাকিস্তানের অনুরোধে চীন ও সৌদি আরব বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি। ১৯৭২ সালের ২৫শে আগস্ট, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ভারতের বাংলাদেশের জাতিসংঘের সদস্যপদের উদ্যোগে চীন ভেটো দেয়। পাকিস্তান ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় এবং চীন স্বীকৃতি দেয় ১৯৭৫ সালের ৩১ আগস্ট। তখনই বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করে। একই সময় নতুন রাজনৈতিক প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে পাকিস্তান ইসলামিক রাষ্ট্র ও মধ্যপ্রাচ্যের দিকে ঝুঁকে পড়ে। শেখ মুজিবের হত্যাকাণ্ডের পর বাংলাদেশের নতুন সরকার পাকিস্তান, চীন এবং আরব বিশ্বের সাথে সম্পর্ক পুনরুজ্জীবিত করে। পাশাপাশি ভারত-সোভিয়েত বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ বিশ্ব রাজনীতিতে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলেছিল। এটি কেবল এ অঞ্চলের মানচিত্রই পরিবর্তন করেনি, ক্ষমতার ভারসাম্যেরও পরিবর্তন এনেছিল।

১১. উপসংহার

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে মুজিব-ইন্দিরা রাজনৈতিক সম্পর্কের ইতিবাচক সূচনা ঘটে। পরবর্তিতে বিশ্ব রাজনীতির বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে এ সম্পর্ক আরো শক্তিশালী হয়েছে। শেখ মুজিব ও ইন্দিরা গান্ধী একে অপরকে কখনো বন্ধু, কখনো কাছের অংশীদার এবং কখনো প্রতিবেশী হিসেবে অভিহিত করেছেন। ইন্দিরা গান্ধীর শক্তিশালী

নেতৃত্বের ফলে সমগ্র ভারতবাসী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সমর্থন-সহযোগিতা করেছিল। ভারতের সমর্থন ছাড়া এতো দ্রুত সময়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব ছিলো না। প্রায় এক কোটি শরণার্থীর ব্যায়ভার বহন এবং ভারতের অভ্যন্তরে বাংলাদেশের মুজিব নগর সরকারকে সহায়তা প্রদানের জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমালোচনা ইন্দিরা গান্ধীকে সহ্য করতে হয়েছিল। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের ইয়াহিয়া-ভুট্টো, চীনের মাও সেতুং-চৌ এনলাই, আমেরিকার নিক্সন-কিসিঞ্জারের সম্মিলিত রণকৌশল ইন্দিরা সাফল্যের সাথে মোকাবেলা করেছিলেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ভারত-রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-চীন মধ্যকার সম্পর্কের নতুন ধারণা জন্ম দেয়। পাশাপাশি বাংলাদেশ ওআইসি সম্মেলনে যোগদানের মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্য ও আরব রাজনীতিতে কিছুটা ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয়। মুজিব-ইন্দিরার মধ্যকার আন্তরিকতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কারণে দ্রুত সময়ের মধ্যে ভারতের সেনাবাহিনী বাংলাদেশ ত্যাগ করে। পাশাপাশি বাংলাদেশ সরকারও দ্রুত এক কোটি শরণার্থীকে নিজ দেশে ফেরত নিয়ে আসে। ২০১১ সালে বাংলাদেশ সরকার স্বাধীনতা যুদ্ধে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ইন্দিরা গান্ধীকে 'বাংলাদেশ স্বাধীনতা সম্মাননা' প্রদান করে। যা কোনো বিদেশি নাগরিকের জন্য সর্বোচ্চ সম্মাননা পদক। এ প্রবন্ধে বাংলাদেশ ও ভারত রাষ্ট্র দুটির মধ্যকার রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক ব্যক্তিগত সম্পর্কের দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা হয়েছে। মুজিব-ইন্দিরা রাজনৈতিক সম্পর্ক তথা দুজন ব্যক্তির মধ্যকার সম্পর্কের ফলে সে সময় উভয় রাষ্ট্রে প্রতিযোগিতার চেয়ে সহযোগিতার পরিমাণ বেশি ছিল। মুজিব-ইন্দিরা রাজনৈতিক সম্পর্ক বিশ্লেষনের মাধ্যমে দুটি রাষ্ট্র নির্ভরশীলতা তত্ত্ব থেকে বেরিয়ে এসেছিল। অর্থাৎ দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের আধিপত্যবাদ নীতির বাইরে দুই নেতৃত্বের পারস্পারিক সম্পর্ক বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। যা যে কোন প্রতিবেশি রাষ্ট্রের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ, স্থিতিশীল ও ইতিবাচক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রভাবক হিসেবে কাজ করবে। সে দিক বিবেচনায় মুজিব-ইন্দিরা রাজনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়নশীল বিশ্বের কাছে দ্বিপাক্ষিক রাজনৈতিক সম্পর্কের মডেল হতে পারে।

তথ্যসূত্র

খোসা, ফায়সাল (২০২২), *মেকিং অব মার্টারস ইন ইন্ডিয়া, পাকিস্তান অ্যান্ড বাংলাদেশ: ইন্দিরা, ভুট্টো অ্যান্ড মুজিব* (হোসেন, প্রমিত), সূচীপত্র: ঢাকা।

চন্দ্র, বিপন, মুখার্জি, মৃ. মুখার্জি, আ. (২০১৩), *ভারতবর্ষ: স্বাধীনতার পরে (১৯৪৭-২০০০)* (লাহিড়ী, আশীষ), আনন্দ পাবলিশার্স: কলকাতা।

জয়কার, পপুল, (২০১৮), *ইন্দিরা গান্ধী: জীবনী*, খান, লিয়াকত আলী (অনুবাদক) নালান্দা: ঢাকা;

দাশগুপ্ত, সুখরঞ্জন (২০২২), *বঙ্গবন্ধু ও ইন্দিরা গান্ধী: দুই মহিরুহের ছায়া*, জিনিয়াস পাবলিকেশন্স: ঢাকা।

দে, তপন কুমার (২০১৯), *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ইন্দিরা গান্ধীর ভূমিকা*, কাকলী প্রকাশনী: ঢাকা।

দৈনিক জনকণ্ঠ (২০২৩), বঙ্গবন্ধুর মুক্তি নিশ্চিতে নেপথ্যে কাজ করেন ইন্দিরা গান্ধী, ৮ জানুয়ারি।

নিজাম, নঈম (২০২০), মুজিব ইন্দিরা ভুট্টো বেনজির হত্যা ট্র্যাজেডি, *ঢাকা টাইমস*, ১৬ আগষ্ট।

রহমান, শেখ মুজিবুর (২০১২), *অসমাপ্ত আত্মজীবন*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেডঃ ঢাকা।

সরকার,অনিল কুমার (২০২২), ইতিহাসের দৃষ্টিকোন থেকে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ও ইন্দিরা গান্ধী, *উত্তর প্রসঙ্গ*, ১৬ বর্ষ।

সরকার, বিভুরঞ্জন (২০২৩), বঙ্গবন্ধু ও ইন্দিরা গান্ধীর নীতি-আদর্শের মিল এবং প্রাসঙ্গিক কিছু কথা, *বিডি নিউজ*, ৯ জানুয়ারী।

সরকার, বিমল (২০২১), আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ও ইন্দিরা গান্ধী, *দৈনিক যুগান্তর*, ০৭ ডিসেম্বর।

সেলিম, মোহাম্মদ (২০০৯), *বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক*, বাংলা একাডেমীঃ ঢাকা।

সেলিম, মোহাম্মদ (২০০৪), বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও ভারতের রাজনৈতিক দল, বাংলাদেশ চর্চাঃ ঢাকা

ফায়েক উজ্জামান, মোহাম্মদ (২০০৮), *মুজিব নগর সরকার ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, বাংলা একাডেমীঃ ঢাকা

বিবিসি বাংলা (২০২০), শেখ মুজিব ও ইন্দিরা গান্ধীর প্রথম দেখা হওয়ার দিনটি, ১০ জানুয়ারি।

হাসান, সোহরাব (২০১৫), মুজিব-ইন্দিরা থেকে হাসিনা-মোদি, *দৈনিক প্রথম আলো*, ০৭ জুন।

হোসেন, আকবর (২০২০), মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১ঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের শেষ ১০ দিন শক্তিধর দেশগুলো যেভাবে ঠান্ডা লড়াইয়ে লিপ্ত হয়েছিল, *বিবিসি বাংলা*, ১৫ ডিসেম্বর।

হোসেন, সৈয়দ আনোয়ার (১৯৮২), *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বৃহৎ শক্তিবর্গের ভূমিকা*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশঃ ঢাকা।

Mahboob, M. A. (2020), Bangabandhu: A political entrepreneur, March 13, *The Financial Express*, <https://thefinancialexpress.com.bd/views/bangabandhu-a-political-entrepreneur-1584113347>

Andrews, E. (2018). How Ping-Pong Diplomacy Thawed the Cold War. *History*, October 19, https://www.history.com/news/ping-pong-diplomacy

Bhuiyan, Md. A. W. (1982). *Emergence of Bangladesh and Role of Awami League*. পাঞ্জেরী পাবলিকেশনস লি.: ঢাকা।

Choudhury, Ishfaq Ilahi Air Cdre (Retd), (2009), https://archive.thedailystar.net/suppliments/2009/december/victorydayspecial/page09.htm

Islam, M. S. (2020). Indira Gandhi's role in Bangladesh liberation war. January 22, https://www.newagebd.net/article/97286/indira-gandhis-role-in-bangladesh-liberation-war

Pattanaik, S. S., (2020). Remembering Bangladesh's Liberation War. *Institute for Defence Studies and Analyses*, December 16, <https://www.idsa.in/idsacomments/bangladeshs-liberation-war-sspattanaik-161220>

The Guardian, (1984), Indira Gandhi obituary. November 1, <https://www.theguardian.com/world/1984/nov/01/india.guardianobituaries>, accessed on 6march2023